মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা ও এর ভবিষ্যৎ

সাগর পাড়ি দিতে ইচ্ছুক, কঠোর পরিশ্রমে আগ্রহী, সাহসী, বাণিজ্যিক জাহাজে কাজ করতে চান এমন ব্যক্তিদের জন্য মেরিন পেশাটি বেশ পছন্দের পেশা। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। এই পেশায় বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যায়। সেই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার, আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায়। বাংলাদেশি মেরিনাররা প্রতি বছর দেশের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য ক্যাডেট ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এটি চট্টগ্রামের জলদিয়াতে অবস্থিত। মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এটি ছিল একমাত্র নৌ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর মেরিন একাডেমী পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার। প্রারম্ভিকভাবে ৪০ জন ক্যাডেট নিয়ে (২০ জন নটিক্যাল ও ২০ জন ইঞ্জিনিয়ারিং) এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে প্রতিবছর ২০০এর অধিক ক্যাডেট মেরিন একাডেমী চট্টগ্রামে ভর্তি হয় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার ক্যাডেট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী চট্টগ্রাম ওয়াল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, সুইডেন এর অধীনে নিবন্ধিত।

এছাড়াও ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ বাণিজ্যিক সেক্টরের জন্য পেশা ভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার মেরিন পেশাকে আরো বিকশিত করার লক্ষ্যে পাবনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশালে নতুন চারটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে ও এগুলির ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এছাড়াও আরো তিনটি প্রাইভেট মেরিন একাডেমি চালু রয়েছে।

বাংলাদেশে এখন প্রতিবছর প্রায় ৫০০ জন মেরিন ক্যাডেট সরকারি এবং প্রাইভেট একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে

হয়েছে। আইনি সুরক্ষা, কর সুবিধা ও ক্রমবর্ধমান ফ্রেইট চার্জের কারণে এই খাতে নতুন বিনিয়োগ বেড়েছে। দেশে বিদেশে জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মেরিনারদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মেরিন সেক্টরকে আরো এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আরো বেশি জাহাজ ক্রয় করা প্রয়োজন, তাতে আরো বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই সাথে মেরিনারদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করলে বিদেশি কোম্পানিতে চাকরিরত মেরিনাররা আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশে পাঠাতে পারবে।

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন বা আই এম ও করোনা কালে মেরিনারদের আন্তর্জাতিকভাবে কি ওয়ার্কার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে কারণ তারা করোনার মধ্যেও বিশ্ব অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে । তরুণরা মেরিন পেশায় অনেক বেশি আগ্রহী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে দেশে
- বিদেশে মেরিনারদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

মুজিবনগর দিবস ও বাংলাদেশ

পৃথিবীর জাতীগোষ্ঠীর ইতিহাস উত্থান পতন অত্যাচার নিপীড়ণ রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সংঘটিত ও বিস্তারিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত জাতি দেশ নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে সে সমস্ত দেশগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অত্যাচার বিপ্লব সংঘাত রক্তপাতের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠা ও মুক্তি এসেছে।

পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। অসংখ্য উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম সংঘাত অবশেষে ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর যে ঐতিহাসিক ভাষণ সেই ভাষণ অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছিল। সামনে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে শেষ বাক্যটির পূর্বে যে বাক্যটি বলেছিলেন এবং গভীর অভিব্যক্তি সহকারে প্রকাশ করেছিলেন “মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।”

[illegible]

[illegible] :
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible] ([illegible])
[illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

Politics is not a pouch of tobacco, it cannot be handed over, it must be earn G.B. Show [illegible]

[illegible]

মাটি ও মানুষের ভাব ও ভাবনাকে অঙ্কুরিত করেছেন। গভীর মমতায় বুকে ধারণ করেছেন বলেই তিনি বলতে পেরেছেন, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।” এভাবেই ১৭ এপ্রিলের শপথ গ্রহণের পরেই যথার্থভাবে আমাদের মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়। তাঁর উদ্দাত্ত কণ্ঠের ঘোষণা, “রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব”। এভাবেই মুজিবনগরের ১৭ এপ্রিল বিশ্বের মানচিত্রে জ্বাজল্যমান হয়ে উঠল। সেই থেকেই মুজিবনগর সারা বাংলাদেশ তথ্য বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল।

সমগ্র দেশ, সমবেত জনতা, জাতির প্রতিটি মানুষ তার এই ঐতিহাসিক ভাষণকে স্বাগত জানিয়েছিল, প্রাণের কথা মনে করেছিল। মনে করেছিল জীবনের মুক্তির কথা। বঙ্গবন্ধুকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছিল বলেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা নরপিশাচ ইয়াহিয়া খান ও তার সাগরেদরা বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিল এবং ২৫ মার্চ কাল রাত্রি হতেই শুরু হয় মুক্তির সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ, এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর সঙ্গে সঙ্গে বর্বর বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বিডিআর হেড কোয়ার্টার এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে তাদের ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর মাধ্যমে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ তাদের ভয়াবহ নৃশংস হত্যার সম্মুখীন হয়। বিভৎস সেই হত্যাযজ্ঞের মহানায়ক ইয়াহিয়া ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ করে রাখে। মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও তিনি ছিলেন অবিচল, জাতির স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন-নির্ভীক এক মহানায়ক।

মেহেরপুরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রাম হতে জীবন, প্রাণকে বাজি রেখে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিসংগ্রামে সবাই নাম লেখাতে থাকে। তৎকালীন মহকুমার প্রশাসক ছিলেন জনাব তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী। মেহেরপুরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সঙ্গে আরও ছিলেন জনাব মাহবুব উদ্দীন। তখন মেহেরপুরের মাননীয় এমএনএ মরহুম জনাব হুহীউদ্দীন আহমেদ-এর নেতৃত্বে দারিয়াপুরের হাজী ইদ্রিস আলী, গাংনীর জালাল উদ্দীন, ইসমাইল হোসেন, ইসরাইল হোসেন, আব্দুল মান্নান মাষ্টার, শাহবাজ উদ্দীন লিঙ্গু, আতাউল হাকিম (লালমিয়া), খাদেম আলী, আসকার আলী, নৈমুদ্দিন, মেহেদী বিল্লাহ প্রমুখের নাম উল্লেখ যোগ্য। এঁরা তাঁদের যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে অকৃপণভাবে দেশের জন্য কাজ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন জাগরণে তাঁদের অবদান বাংলাদেশ তথা মেহেরপুরের ইতিহাস চির জাজ্বল্যমান হয়ে থাকে।

সিন্ডিকেট ভেঙে ইতিশীল হবে ভোগ্য
এভাবেই নয় মাসের মুক্তির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ । কিন্তু যথার্থভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের রক্তক্ষরণ ও স্বপ্নের বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি কি? আজকে সূবর্ণ জয়ন্তীর পরবর্তী সময়ে সামাজিক বৈষম্য গুম খুন ধর্ষণ কালোবাজারী যেভাবে বিস্তার লাভ করেছে তাতে এদেশের সকল মুক্তিকামী মানুষ সঙ্কিত বিহ্বল ও মর্মাহত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তাবয়ন করতে হলে ১৭ এপ্রিলের শপথকে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

লেথক সাহিত্যিক ও গবেষক

বাঙালির যুক্তি, তর্ক ও ধর্মভাবনা

হিন্দু-মুসলমান সবার জন্য বৈষ্ণবরা তাদের হরিসভা উন্মুক্ত করে রাখে। ফটিকছড়ির মাইজভান্ডার শরিফের উরসে হিন্দুদের বসবার ব্যবস্থা থাকে। বায়েজিদ বোস্তামি ও হযরত শাহজালালের মাজার প্রাঙ্গণে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাই মানত করে, শিরনি দেয়। লালনের আখড়ায় ধর্মেবর্ণের ভেদ থাকে না। ইতিহাস ঘেঁটে, পুঁথি-পাঁচালির জীর্ণ পাতা উলটিয়ে জানা যায়, বাঙালি চিরকাল ধর্মপ্রাণ, তবে ধর্মান্ধ নয়। ধর্মের প্রাত্যহিক আচার-আচরণ নিষ্ঠার সাথে পালন করে, কিন্তু জীবনকে তুচ্ছ ভাবে না। জীবন ও অস্তিত্বের জন্য যা দরকারি মনে করে, তা-ই গ্রহণ ও পালন করে। হোক তা ধর্মের আচার-স্পিরিটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা অসঙ্গতিপূর্ণ।

জীবন ও জীবিকার জন্য বাঙালি অন্যদেশের ধর্ম নিয়েছে, ভাষা নিয়েছে,

কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত মানবধর্ম ত্যাগ করেনি। বাঙালির ধর্ম আসলে স্বনির্মিত ধর্ম। এজন্যে বাংলার জল হাওয়ায় কট্টর শরিয়তি ইসলাম তেমন শেকড় গাড়তে পারেনি। এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছে সত্যপীর, পাঁচপীর, পাঁচগাজী, মানিকপীররা। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানত-শিরনি দিয়েছে সত্যপীরের দরগায়। মুসলমানের সত্যপীর হিন্দুর কাছে হয়ে ওঠে সত্য নারায়ণ। তাই নিরন্ন-বিপন্ন, বিপর্যস্ত, শোষিত হিন্দু মুসলমান বাঁচার তাগিদে বলেছে:
‘ হিন্দুর দেবতা তিনি মুসলমানের পীর।/ দুইকুলে সেবা লয় হইয়া জাহির।’

সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পারলৌকিক মুক্তিদানের বা পাপ-পুণ্যের দেবতা নন। তিনি জাগতিক মঙ্গলবিধানের লৌকিক দেবতা। রোগ-বালাই, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তির জন্য তার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। লোকমানস প্রসূত এই পীরের অনুসারীরা সাধারণত সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক ও পীড়িত। কিন্তু যুক্তিবাদী, জিজ্ঞাসু ও ইহজাগতিক। রাজনৈতিক পরিভাষায় আমরা যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতা বলি, তা নিয়ে কয়েক শো আগেই এদেশের পীর-সাধক, ভাবুকরা চিন্তা করেছেন। জাতগোত্রহীন মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের কথা ভেবেছেন। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস বলেছিলেন: ‘শুন’হ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’ চণ্ডীদাসের সমসাময়িক চৈতন্যদেবও উচ্চবর্ণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ ত্যাগ করে প্রেমভক্তিবাদী মানবধর্ম প্রচার করেছেন। এই মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে চণ্ডাল, মুচি, নমশূদ্রসহ বহু মুসলমান তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মুসলমান সূফি দরবেশরাও ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে গিয়ে মূলত প্রেম ও মানবিকতার বাণী প্রচার করেছেন। অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেম ও মানবতার বাণী সবচেয়ে বেশি করে প্রচার করেছেন লালন এবং বাংলার বাউল সাধকরা।

মানবপ্রেমী লালন ফকির বলেছেন: ‘এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে/সেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান/জাতি গোত্র নাহি রবে।’

লালনের অনেক গানেই বাঙালির আসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। দারিদ্র্যপীড়িত নির্জন-নিভৃত পল্লিতে বসবাস করেও তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন যেখানে ধর্মের নামে ভেদাভেদ ও শোষণ বঞ্চণার কোনো জায়গা নেই। সমতা ও ন্যায়বিচারের কথা তিনি গানে গানেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। গানের হাতিয়ার দিয়েই তিনি সাম্প্রদায়িক প্রজাপীড়ক রাজন্যবর্গকে বিনাশ করতে চেয়েছেন।

লালনের মতো বঙ্গবন্ধুও বলেছেন, ‘২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি এই বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।’
শুধু লালন না, এ ভূখণ্ডের সূফি-সাধক, রাষ্ট্রচিন্তক থেকে ও কবিরা পর্যন্ত প্রায় সকলেই মানবিকতা, মনুষ্যত্ব অসাম্প্রদায়িকতার জয়গান গেয়েছেন। ‘শুন’হ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’– আধুনিক হিউম্যানিজমের সারসত্য মধ্যযুগের চণ্ডীদাসের এই ঘোষণার মধ্যেই নিহিত আছে। যারা গড়পড়তা ধর্ম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তারা হয়তো এই ঘোষণার সাথে একমত পোষণ করতে পারবেন না। কিন্তু তারাও মানুষকে বড় করে দেখেছেন। ইউরোপের তখনকার হিউম্যানিস্টরা যে অর্থে হিউম্যানিস্ট সেই অর্থে চৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস থেকে লালন, হাছন ও অন্যান্য মরমিরাও হিউম্যানিস্ট। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার গ্রামীণ জীবনভাবনা ও ধর্মচেতনা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে লালন, কুবির গোঁসাই, মদন বাউলদের মতো মরমি সাধক ও বাউলদের ভাবসমৃদ্ধ ও তত্ত্বাশ্রয়ী গানের মাধ্যমে। এসব গানের স্রষ্টারা অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর, অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং সামাজিকভাবে দীর্ণ। কিন্তু সর্বোতভাবে তার্কিক ও দার্শনিক। ধর্মের নানা দিক নিয়ে এঁরা তর্ক করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যেমন তর্ক করতেন, মুসলমান মৌলভীরাও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। তেমনই লালন এবং অন্য ভাবুক, সাধকরাও তর্কযুদ্ধে মেতে উঠতেন আখড়া- আশ্রমে, গানের মাহফিলে কিংবা সাধুসঙ্গে।

তর্ক করতে গিয়ে এক আসরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বাউল সম্রাট লালন বলেছেন: ‘সুন্নত দিলে হয় মুসলমান / নারীর তবে কী হয় বিধানÑ/বামুন চিনি পৈতায় প্রমাণ/ বামনী চিনি কীসে রে।’

ভেবে বিস্মিত হই যে, লালনের মত এক নিরক্ষর, গেঁয়ো বাউল এমন ক্ষুরধার যুক্তি, দর্শনসমৃদ্ধ ভাবনা পেলেন কোথায়? কোন গুরু তাকে এসব শেখালো? তিনি তার ভাবনাগুলি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীলভাবে গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। গানের মধ্য দিয়ে তিনি কেবল বর্ণাশ্রম প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি, সাহসিকতার সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন, হিন্দু মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসের নানাদিক নিয়েও।

লালনের জন্ম মধ্যযুগ ছুঁয়ে যাওয়া ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ ধরা হলে, তাঁকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরদের সমসাময়িক বলা চলে। অথচ এই নিরক্ষর সাধকের সাথে সে সময়ের কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নবজাগৃতির

পুরোধাদের কতই না ফারাক! লালন যেসময়ে হিন্দু মুসলমানের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতা, সম্প্রীতি ও ধর্মসমন্বয়ের কথা চিন্তা করেছেন, সেই একই সময়ে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশব সেনরা তাদের সংস্কার আন্দোলন হিন্দুদের গণ্ডির মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। অন্যদিকে ওহাবি-ফরায়েজি ও সৈয়দ আহমেদের ‘তরিকা ই মহম্মদীয়’ আন্দোলনের প্রয়াস ছিল কেবল মুসলমান সমাজকে বিশুদ্ধ ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার মধ্যে পরিসীমিত। কোনো পক্ষই সেইভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে এক ময়দানে মিলিত করতে চাননি। কিন্তু লালন ও লালন-উত্তর লোকায়তবাদী মরমি সাধকরা নিম্নবর্গের কৃষিজীবী সমাজকে কেবল কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, শাস্ত্রাচারের পথ থেকে নিবৃত্তই করেননি, তাদের মধ্যে মানবপ্রেম ও অসাম্প্রদায়িক ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছেন। আসলে আঠারো-উনিশ শতকে বাংলার লোকায়ত সাধক, কবি ও পদকর্তাদের মধ্যে ধর্মসমন্বয়ের বিস্ময়কর উদ্যোগ লক্ষ করা গেছে। ধর্মান্তকরণের প্রবল ঝড়ো হাওয়া আর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প মাখানো প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে কুবির গোঁসাই গেয়েছেন: ‘ অগণনায় বর্ণ লেখা / রাধাকৃষ্ণ, যিশুখ্রিস্ট খোদাআল্লা এক।’

গীতিকার জালালুদ্দিন বলেছেন: ‘ করিম কিষণ হরি হযরত লীলার ছলে ঘোরে/ ভাবে ডুবে খুঁজে দেখ/ ভেদাভদ কিছু নাই রে।’
লালনও ধর্মসমন্বয় চেতনায় শাণিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছেন: ‘ সে তো ও নিষ্ঠুর কালা/ নাইকো তার বিচ্ছেদজ্বালা।/ আমার চক্ষু বুঁজে জপমালা/ লা-শারিকাল্লা সে কালা।’

এদের গানের ভাবৈশ্বর্য, ধ্বনিমাধুর্য ও যুক্তির বুনোট অনবদ্য। বাংলার লোকায়ত সাধকদের এই উদার ভেদবুদ্ধিহীন, মানবিক ভাবনা উচ্চবর্গীয় সমাজ মেনে নেয়নি। যেখানে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই সমাজের শক্তিমানরা রুষ্ট, ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয়বাদী স্রোতটি ঠেকাতে পারেনি। গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষ আজও ধর্ম মানার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ বড় করে না-দেখে, আবেগকে বড় করে দেখেছে। বাংলার লোকসমাজের কাছে নাস্তিকতা বা ধর্মবিরোধিতা প্রাধান্য পায়নি, প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক অধ্যাত্মবাদ। মওলানা- মৌলভী-পুরহিতদের চেয়ে এরা মান্য করে পির-মুরশিদ, গুরু- গোঁসাইদেরÑ যাঁরা শাস্ত্রের ধর্মের চেয়ে আত্মা ও অন্তরের ধর্মকে বড় করে দেখেন। রাজনৈতিক ভাঙাগড়া, ধর্মের নামে বাড়াবাড়ির মধ্যেও আজও নিরক্ষর, গ্রাম্য গায়কের হৃদয় ছোঁয়া গানে অখণ্ড মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সমন্বয়বাদী দর্শনের মর্মকথা শুনতে পাওয়া যায়:

‘ মরুতে এলেন মোহাম্মদ/ মথুরাতে গেলেন শ্যামÑ/ ইমাম খেলেন রসুল/লীলা খেলেন ঘনশ্যাম,/ মা আয়েশা পাগল হলেন/ নবির প্রেমে মদিনায়/বাঁশির সুরে পাগল হয়ে/ রাধা চলে যমুনায়/ একই মায়ের দুটি সন্তান/হিন্দু আর মুসলমান/ একই কুলে জন্ম মোদের/ একই বুকে দুগ্ধপান।/ দেখে আয় ভাই হিন্দু মুসলিম/ মদিনা আর মথুরায়/ দুই রাখালে যুক্তি ক’রে/ গরু আর বকরি চরায়।’ (সুধীর চক্রবর্তী: ‘ব্রাত্য লোকায়ত লালন’। রচনা সমগ্র। কলকাতা বইমেলা ২০১০, পৃ: ৩৩০।)

এমন স্বচ্ছ, সহজ গান আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত তো করে, সেই সাথে এই গানে আমরা খুঁজে পাই সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে বেঁচে থাকার সাহস ও মানুষকে ভালবাসার সহজ যুক্তি। মনের গহনে প্রশ্ন জাগে: এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই যুক্তি তারা কোথা থেকে পেলেন? এর উৎসই বা কী? বাংলার প্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্যই কী তাদের এই উদার মানবিক ভাবনার রস ও রসদ জুগিয়েছে? বাংলার ভূগোল কী বাঙালিকে ধর্মসহিষ্ণু করে তুলেছে? না কী তাদের জিজ্ঞাসু মন? হয়তো সেই কারণে লালন, দুদ্দু শাহ ও মদন বাউলের আমাদের অন্দর থেকে অন্তরে প্রবেশ করেছেন। আর এ কারণে বোধহয় পহেলা বৈশাখ, বর্ষাবরণ, নবান্ন উৎসব, পৌষ পার্বণ, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি ঋতুভিত্তিক উৎসবগুলি বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান জোরেসোরেই উদযাপন করছে। মৌলভী-মওলানারা এগুলিকে হিন্দুয়ানি কৃত্য বলে ফতোয়া দিলেও জনমানুষ সেটা গ্রহণ করছে না।

সত্যি বলতে কি, মানুষকে প্রকৃতিলগ্ন হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। প্রকৃতিময়তার মধ্যে তাকে পালন করতে ধর্মের নানাসব কৃত্যাচার। প্রকৃতির মধ্যেই সে তার ঈশ্বর আবিষ্কার করে। আল্লাহকে খোঁজে। বাঙালিকেও প্রকৃতির রূপ-অরূপের লীলার মধ্যে বাঁচতে হয়, ধর্ম পালন করতে হয়। নবান্ন বাঙালি মুসলমানের কাছে কেবলই একটি লোকজ উৎসব, কোনো ধর্মীয় কৃত্যাচার নয়। ঘট-লক্ষ্মীতে মুসলমান বিশ্বাস করে না, কিন্তু ধান-লক্ষ্মী তার মধ্যে এক ভিন্নমাত্রিক অনুভব জাগিয়ে তোলে। হেমন্তের একগুচ্ছ পাকা ধানের শীষ তার কাছে অর্ঘ্য দাবি করে, কারণ ভাত খেয়ে সে বেঁচে থাকে। জীবন ও অস্তিত্বের জন্যই বাঙালিকে ধর্মসহিষ্ণু, মানবিক ও সমন্বয়বাদী হতে হয়েছে। জীবন যেখানে মেলাতে চায় কিংবা মিলিয়ে রেখেছে, সেখানে ধর্মকে তো সহিষ্ণু হতেই হবে। যুক্তিবাবাদী-ধর্মনিষ্ঠ বাঙালির কাছে জীবনই সত্য, মৃত্যু নয়্। তার কাছে ‘এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। জীবনকে তাৎপর্যমণ্ডিত করতেই তার সকল সাধনা, সকল প্রয়াস। জীবনকে পত্র-পুষ্পে পুষ্পিত করতেই বাঙালি উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়বাদী হয়েছে।

এস এম সুলতান একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেন: ‘ হিন্দু মুসলমান সবাই বৈষ্ণব পদাবলী লিখত। কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি, আফজল খাঁ, মালাধর বসু- এরা সবাই রাজকবি। এঁরা বৈষ্ণব পদ লিখেছেন। মুসলমানরাও লিখেছে, মুসলমানদের ওই এক ইউসুফ-জুলেখা লেখা হয়েছে। এগুলো বেসিক্যালি সব সেক্যুলার বই। রামায়ণ ছিল কাব্য, ওটাকে ধর্মগ্রন্থ করেছে সামন্তপ্রভুরা, ওরাই সব ডিভিসন করেছে।.. বাঙালির কোনো অলি-দরবেশ নাই, তোমরা তো অলি হতে পারবে না, তাই আল্লাহ আল্লাহ করো। সুলতানরা সব শিখিয়ে দিল, হিন্দুদের বলল, সন্ন্যাস তোমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না তাই তুমি হরিনাম জপ করো, জ্ঞান পাবে। এখন হরিনাম কী? ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষর। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—- হরে রাম হরে রাম। (রাম, কৃষ্ণ) সব বাংলার বাইরের, বাংলার সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নাই। বাঙালি মূলত ত্যাগী, সংযমী, সত্যবাদী, অতিথিপরায়ণ। আমাদের মধ্যে অনেক বড়মাপের অ্যাবসোলিউট থিংকার তৈরি হয়েছে, সেক্যুলার থিংকার। কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, তারপর ওই মধুসূদন, রবীন্দ্রসাথ, নজরুল। বিদ্যাসাগর আরেকজন বড় মানুষ। মসুসূদনের মেঘনাদ কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব, শর্মিষ্ঠা এগুলো রিলিজিয়াস মোটিফ নিয়ে লেখা হলেও ওগুলো আসলে অসাম্প্রদায়িক।’ (শাহাদুজ্জামান: ‘কথা পরম্পরা’। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা। দ্বি-স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭। পৃ: ২৮)

লালনকেও বড় মাপের থিংকার এবং সর্বধর্মের মিলনসাধক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনিও সবাইকে বাঁচাতে, লড়তে ও মরতে চেয়েছেন।

আবদুল্লাহ আল আমিন: লেখক ও লোকগবেষক, সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২১ এর অসঙ্গতি ও দুটি কথা

২০২১ সনে ভূমি মন্ত্রণালয় আলাচ্য আইনের খসড়াটি তৈরি করে এবং ১৯.০১.২০২২ খ্রি. তারিখে এই প্রস্তাবিত আইনের খসড়াটি জনসাধারণের

আদালতে বিচার পাচ্ছে না এবং জনগনের ভোগান্তি হচ্ছে…”। দলিল সংক্রান্ত বিষয়াদি কখনোই ভূমি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত নহে এবং দেশের আদালতসমূহকে অক্ষম বর্ণনা করে আদালতের বাইরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচার করার মাধ্যমে আদালতসমূহকে অকার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং একরকম আদালতকে অবমাননা করা হয়েছে। ধারা- ২(৪): “আদালত” অর্থ এই আইনের ধারা ২৮ এ বর্ণিত যেকোন আদালত; এখানে ধারা ২৯ হবে, ভুল করে ধারা ২৮ উল্লেখ করা হয়েছে। ধারা ২৯ এ বলা হয়েছে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে অনর্ভূক্তকরণ সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্টের অধীনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। এছাড়া এই আইনে ‘পাওয়ার অব এটর্নি’ শব্দের পরিবর্তে ‘আমমোক্তারনামা’ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। আমমোক্তারনামা বলতে জেনারেল পাওয়ার অব এটর্নি বোঝায়। অথচ পাওয়ার অব এটর্নি আইন, ২০১২ এ অনেক ধরণের পাওয়ার অব এটর্নির কথা উল্লেখ আছে।

দলিল সম্পর্কিত ধারাসমূহ নিম্নরূপ:
ধারা-৪: অন্যের জমির মালিক হইবার মানসে জাল দলিল সৃষ্টির দণ্ড। ধারা-৫: মালিকানার অতিরিক্ত জমির দলিল সম্পাদনের দণ্ড।
ধারা-৬: মালিকানার অতিরিক্ত জমি লিখিয়া নেওয়ার দণ্ড।
ধারা-৭:- পূর্ব বিক্রয় বা হস্তান্তর গোপন করিয়া কোন জমি বিক্রয়ের দণ্ড।
ধারা-৮: বায়নাকৃত জমি পুনরায় চুক্তিবদ্ধ হইবার দণ্ড।
ধারা-৯: ভুল বুঝাইয়া দানপত্র ইত্যাদি সৃজনের দণ্ড।
ধারা-১০: সহ-উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া প্রাপ্যতার অধিক জমির নিজ নামে দলিলাদি সৃষ্টির দণ্ড।
ধারা-১১: সহ-উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া নিজের প্রাপ্যতার অধিক জমি বিক্রয়ের দণ্ড।
ধারা-১৭: অধিগ্রহণের পূর্বে জমির মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত মূল্যে দলিল নিবন্ধনের দণ্ড।

উপর্যুক্ত সকল ধারা দলিল সংক্রান্ত যা ভূমি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নহে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে নিবন্ধন অধিদফতর এর নিয়ন্ত্রণকারী আইন ও বিচার বিভাগ। এমনকি এই আইন প্রস্তুতকালীন মাঠ পর্যায়ে দলিল নিয়ে কাজ করা রেজিস্টারিং অফিসার দূরের কথা মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন বাংলাদেশ এর কাছেও কোন মতামত চাওয়া হয় নাই। ধারা-২৬: জমির পরিমাণ ও ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য

অনুযায়ী বর্ধিত সাজা। এই ধারায় জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সাজার মেয়াদ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে যা সঠিক হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এটি জমির মূল্য অনুযায়ী হলে বাস্তব সম্মত হতো। এই আইনের কালো ধারা হলো ২৮। ধারা-২৮: অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচনা ইত্যাদির দণ্ড।

এই অধ্যায়ে বর্ণিত যেকোন অপরাধ সংঘটনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করিলে তাহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য সহায়তা প্রদানকারী অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডণীয় হইবেন। এক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারিং অফিসার এর সুরক্ষা লঙ্ঘিত হবে এবং মোবাইল কোর্টের নামে প্রাত্যহিক স্বাভাবিক কাজ ও সেবা বিঘ্নিত করা হবে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে এই প্রস্তাবিত ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনের ধারা ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭ ও ২০ কোনভাবেই সংযোজিত হওয়া উচিৎ নয়। কেননা এইসব অপরাধের বিচারের জন্য একাধিক সরকারি সংস্থার রেকর্ডপত্রের সংশ্লিষ্টতা থাকে। কেবল পক্ষগণ কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলাদির উপর ভিত্তি করে এসব অপরাধের বিচার মোবাইল কোর্টের অধীনে সম্ভব নয় এবং সমীচীন নয়। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রচলিত আদালতে বিদ্যমান আইনে প্রতিকার এর সুযোগ আছে এবং এই নতুন আইনে নতুন কোন ইস্যু নেই যা আদালতের প্রচলিত আইনে বিচার্য নহে।

ধারা-৩০: প্রশাসনিক জরিমানা। সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে তাহার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় সংঘটিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে। এই ধারায় জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পাশাপাশি নিবন্ধনের সহিত সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রারকে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করা হয় নাই। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ অধিদফতরের সহকারী পরিচালকগণ জরিমানা আরোপ ও আদায়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান।

ধারা-৩২: অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি। এই আইনের অধীন সংঘটিত যেকোন অপরাধের প্রতিকার চাহিয়া ভূমি সংশ্লিষ্ট থানা বা উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে। ধারা-৩৪: অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা। এই ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের এর পাশাপাশি নিবন্ধনের সহিত সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে সাব-রেজিস্ট্রারকে অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করা হয় নাই।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ অধিদফতরের সহকারী পরিচালকগণ জরিমানা আরোপ ও আদেশ প্রদানে ক্ষমতাবান। ধারা-৪৬: আদালতের নির্দেশনা সম্পর্কিত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ। ধারা ৪৬(৪)-এ নির্দেশনা প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে নোটিং করার কথা বলা হয়েছে। ৪৬(৫): মামলায় পক্ষভূক্ত যেকোন ব্যক্তি আদালত প্রদত্ত রায় বা আদেশের কপি দলিল সংশ্লিষ্ট যেকোন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিলে উহা গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা(৩) ও (৪) এর বিধান অনুযায়ী অবিলম্বে করণীয় সম্পন্ন করিবেন। ৪৬(৬) এ ৪৬(২), ৪৬(৩), ৪৬(৪) ও ৪৬(৫) এর নির্দেশনা পরিপালনের ব্যর্থতার জন্য গুরুদণ্ড শ্রেণিভূক্ত অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেওয়ানি আদালতের আদেশ, ডিক্রি ও রায় মোতাবেক এই ধারার নির্দেশনা বর্তমানেও আমরা পরিপালন করে থাকি। কিন্তু ধারা ৪৬(৫) এর নির্দেশনা পরিপালন করা হইলে পক্ষগণ দ্বারা জালিয়াতি সংঘটিত হতে পারে। এই উপধারা কোনভাবেই সংযোজন হতে পারে না এবং এটা বাঞ্ছনীয় নয়। ধারা-৪৯: সরল বিশ্বাসে কৃত কর্মের জন্য অর্থাৎ এসবের বিচার করতে গিয়ে ভুলে কাউকে অন্যায় জেল বা জরিমানা করা হলেও ইউ এন ও, এসি ল্যান্ডকে দায়ী করা যাবে না। এতে স্বেচ্ছাচারিতা ও অপব্যবহার এর সুযোগ প্রসারিত হবে।

যে কোন মন্ত্রণালয় তার সংশ্লিষ্ট বিষয় এর ব্যাপারে আইন করতেই পারে কিন্তু অন্য মন্ত্রবালয়কে বা দপ্তরকে ছকে ফেলতে চাইলে সেটা হবে দূরভিসন্ধি। ভূমি অপরাধ আইন শুধু দলিল সম্পর্কিত না হয়ে যদি খারিজ খাজনা ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন হতো তাহলে কোন আপত্তি হতো না। দলিল তো শুধু ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে হয় না, অন্যান্য বিষয়ের উপরও হয়। প্রস্তাবিত আইনের ০৭ নম্বর ধারা হলফনামার সাথে সাংঘর্ষিক। ৮ নম্বর ধারা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ এর পরিপন্থী। ৫৩ (বি) টি পি এক্ট দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিত আইনের ৯ নম্বর ধারায় ভুল বুঝিয়ে দানপত্র শব্দটির কোন ব্যাখ্যা করা হয় নাই। এটি যে কারও বিরুদ্ধে যখন তখন ব্যবহার করা যাবে।

উদ্ভূত সমস্যা সমাধান যেসব বিষয়র দিকে খেয়াল করা যেতে পারে:
১) আলোচ্য আইনের ধারা ৪ থেকে ১০ এবং ১৭, ২৮ একান্তভাবে নিবন্ধন অধিদপ্তর তথা আইন ও বিচার বিভাগের এর আওতাভুক্ত। দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত সকল ধারা প্রস্তাবিত আইনে বাদ যাবে। যেহেতু এটি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক একতরফাভাবে সৃজিত এবং তাদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়াদি ও সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত তাই এই আইন ভূমি নামজারি, খাজনা গ্রহণ, তদন্তে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে

প্রতিবেদন প্রদান এবং এডিসি রেভিনিউ বা এডিএম কোর্টে মামলা, ডিসি অফিস এলএ শাখার সেবা, এবং ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি বরাদ্দ প্রদানে মনোনয়ন এবং হাট বাজার জলমহাল ইজারা প্রদান এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের জন্য উত্তোলিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর তথা স্থানীয় সরকার কর সঠিকভাবে বন্টনে অনিয়ম, অপরাধ ও অন্যান্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিষয়াদি নিয়েই শুধু এই আইন হতে পারে। এই আইন প্রস্তুতের সময় মাঠ পর্যায়ে শুধু এসি ল্যান্ড এর কাছে মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং কোন নিবন্ধন অধিদপ্তর বা রেজিস্ট্রারিং অফিসারদের এর কাছে কোন রূপ মতামত না চাওয়া এটি রুলস অফ বিজনেস/এলোকেশন অব বিজনেস লঙ্ঘন করেছে মর্মে বাতিলযোগ্য। দলিল সংক্রান্ত সকল ধারায় দলিল নিয়ে যে বিভাগটি কাজ করছে তার কাছে কোন মতামত না চাওয়ায় এটি একটি বাস্তবতা বিবর্জিত, কেতাবি ও জনবিরোধী আইনে পরিণত হবে। তাই এটি সম্পূর্ণ বা আংশিক বাতিলযোগ্য।

২) প্রস্তাবিত আইনে ধারা ২৮ একটি কালো আইন। এটি নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ এর ৮৬ ধারা ও নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৪ এর ৪২ বিধি এর সাথে সাংঘর্ষিক। তদুপরি, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ৪৯ ধারা এর মাধ্যমে যে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে তাতে এই আইনের অপব্যবহার হবে এবং ভুক্তভোগীর কিছুই করার থাকবে না।

৩) দলিল সংক্রান্ত সকল অপরাধ নিবন্ধন অধিদপ্তর তথা আইন ও বিচার বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত হওয়ায় এই সম্পর্কিত অপরাধ প্রতিকারে আইন ও বিচার বিভাগ “নিবন্ধন আইন (সংশোধিত) ২০২৩” প্রণয়ন ও পাস করতে পারে।

৪) যেখানে সারাদেশে বিচারিক কাজ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বিচার বিভাগের কাছে ন্যস্ত করার কথা আলোচনা করা হচ্ছে, মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার বিলুপ্তির কথা বলা হচ্ছে এবং বিশিষ্ট নাগরিক সমাজ থেকে এই বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট থেকে এটি বন্ধে ইতোমধ্যে আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে মোবাইল কোর্টকে আরও ক্ষমতায়ন ও দানবিক রূপ দেবার প্রচেষ্টা প্রস্তাবিত ভূমি অপরাধ দমন ও প্রতিকার আইন, ২০২১-এ করা হয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হলে ভয়ানক রূপ লাভ করবে; তাই এটি আংশিক বাতিলযোগ্য।

৫) জমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করতে আইন করবে সংশ্লিষ্ট আইন মন্ত্রণালয়। আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত ব্যতীত করা এই

ভূমি অপরাধ প্রতিকার ও প্রতিরোধ আইন প্রণয়নের চেষ্টা সম্পূর্ণ বেআইনি ও এখতিয়ার বহির্ভূত।

৬) বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রিতার কথা উল্লেখ করে তা নিরসন করার কথা বলে এই প্রস্তাবিত আইনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়েছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দেওয়ানি আদালতের বিচার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে করিয়ে জুডিশিয়ারির বিচারের ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের হাতে নেয়ার প্রচেষ্টাকারী এই আইন সরাসরি সংবিধানের ২২ ধারার স্বাধীন বিচার বিভাগ এর অস্তিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক।

৮) ভেটিং শাখা, আইন বিচার ও সংসদ বিষিয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রস্তাবিত আইনের খসড়া বাতিল বা অধিকতর সংশোধনের জন্য এই বলে ফেরত পাঠাতে পারে যে, The Land Ministry must limit its proposed law to its prescribed functions or regular responsibilities. The sections that corroborate issues related to deed or instrument fall into the business of Department of Registration under the control of Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs; and thus deserve to be scrapped as opinions from the concerned ministry were not asked for and no dialogue was held with. However, issues related to deed or instrument mentioned in the proposed law can be addressed by enacting Registration Act (Amendment) 2023 that will confer the required power on its own officers.

লেখক: আইনবীদ

পাঠকের হৃদস্পন্দনে উচ্চারিত একটি শব্দ ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

পাঁচ বছর পূর্ণ করে ৬ষ্ঠ বছরে পদার্পণ করলো আমাদের প্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন। শোষক সমাজের রক্তচক্ষু, পদে পদে বাঁধা ডিঙিয়ে প্রতিটি দিন পার করে চলেছি আমরা। তবে যতটা

আমাদের মূলশক্তি।

২০১৮ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসের দিন যাত্রা শুরু করেছিল মেহেরপুর প্রতিদিন। স্বাধীনতার এই মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের যুদ্ধে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার দীপ্ত চেতনায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। অদম্য সাহস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার অংশিদার আমরাও।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন একজন তরুন রাজনীতিবীদ এবং স্বপ্নচারী মানুষ। মেহেরপুর প্রতিদিনের মত আরো কয়েকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। একজন গণমাধ্যমবান্ধব হিসেবে তিনি সমাজে সুপ্রতিষ্টিত এক চরিত্র। তাঁর সুদক্ষ দিকনির্দেশনায় আমরা মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিয়ে গেছি এক অনন্য উচ্চতায়। যা এখন মেহেরপুরের প্রতিটি মানুষের উচ্চারিত একটি নাম। একটি শব্দ মেহেরপুর প্রতিদিন।

মেহেরপুর প্রতিদিন যা পারে, যা পেরেছে অন্য কেউ পারেনি, পারেনা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই আমাদের প্রতিজ্ঞা মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের মুখে মুখেই উচ্চারিত হতে থাকবে সবসময়। অর্ধযুগে পদার্পণের এই শুভক্ষণে সকল পাঠক, শুভান্যুধায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা, কলাকুশলীর প্রতি শুভেচ্ছা।

৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ইপেপার

